মৃত্যুর পরে

পুলক রঞ্জন সেনশর্মা

আজ থেকে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে আমাদের দেশ পূণ্যভূমি জন্মভূমি ভারতবর্ষের আর্য্য ঋষিদের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল চিরন্তন সত্যের বাণী —

"জাতস্য মরণং ধ্রুবম্। জীর্ণবস্ত্রং বিহায় নূতনং গৃহ্নাতি।"

আমি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই, তার পূর্বে কতকগুলো দিক অথবা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা একান্তভাবে প্রয়োজন এবং নিঃসন্দেহে আবশ্যিক।

আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখা উচিত, সমগ্র বিশ্বে শত কোটি কোটি মানুষ বিরাজ করছে, তত কোটি কোটি মানসিকতা, চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি, মতবাদ, তত্ত্ব বিরাজ করছে। কারো চিন্তাধারা, মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মতবাদ, তত্ত্বের সাথে অপরের মিল বা সাদৃশ্য নেই। তবে আংশিকভাবে মিল বা সাদৃশ্য থাকতে পারে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই সর্বাংশে নয়।

অপরদিকে, সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি মানুষের চিন্তাধারা, মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মতবাদ তত্ত্বকে দুটোভাগে ভাগ করা যায়।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরে বিশ্বাসী, ভক্তি পরায়ণ, তার ক্ষেত্রে একরকম হবে। অপরদিকে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী, সন্দেহ পরায়ণ তার ক্ষেত্রে অন্যরকম হবে। এটাই স্বাভাবিক এবং বাস্তব।

বাংলা ভাষায় একটি বহু প্রচলিত প্রবাদ রয়েছে —

কৃষ্ণ কেমন?

যার মন যেমন।

এক শ্রীকৃষ্ণকেই, একেকজন একেকরকমভাবে বিশ্লেষণ করেন।

এবার আমি যাব অন্য একটি প্রসঙ্গে। যদি আমি ভেবে থাকি, আমার চিন্তাধারা দৃষ্টিভঙ্গিকে সকলেই সমর্থন করবেন, তবে এটা হবে সম্পূর্ণ অবাস্তব, ভ্রান্ত ধারণা। আমাকে ভেবে নিতেই হবে, আমার চিন্তাধারা দৃষ্টিভঙ্গিকে কেউ গ্রহণ করবে। আবার কেউ গ্রহণ করবে না। অপরদিকে, অন্যের চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গিকে আমি গ্রহণ করতে পারি, অথবা নাও গ্রহণ করতে পারি।

জ্ঞাতস্য মরণং ধ্রুবম্। জীর্ণবস্ত্রং বিহায় নূতনং গৃহ্নাতি।

আমাদের হিন্দুধর্ম জন্মজন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। শুধুমাত্র হিন্দুধর্মের কথা বললে ভুল হবে। অনুরূপভাবে, বৌদ্ধধর্ম এবং জৈনধর্ম জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী।

মৃত্যুর পরে দেহের বিনাশ ঘটে। কিন্তু আত্মার বিনাশ ঘটে না। আত্মা নতুন দেহ ধারণ করে আবার পৃথিবীতে আসে।

আত্মার অমরত্বকে প্রমাণ করার জন্য, একটি কথা অথবা ঘটনা একাধিকবার বিভিন্ন জনের কাছে শোনা গিয়েছে।

এবার ঘটনার আলোকপাত করছি। একজন মৃতপ্রায় অবশ্যম্ভাবী অনিবার্যভাবে যার অতি অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যু হবেই, এককথায় যেটা সম্পূর্ণরূপে সন্দেহ মুক্ত। এইরূপ মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে একটি কাচের বাক্সের মধ্যে রাখা হয়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, কাচের বাক্সের উপরের ঢাকনাটি ফেটে দুইখানা হয়ে গেল, অর্থাৎ মৃতব্যক্তির আত্মাকে অবরুদ্ধ রাখা গেল না।

এবার জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে সত্য ও বাস্তব ঘটনার আলোকপাত করছি।

ঘটনাটি ঘটেছিল দ্বাপর যুগে। ধ্রুব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাওয়ার পরে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধ্রুবকে বলেছিলেন, "ধ্রুব! তুমি কিন্তু একজন্মে আমাকে পাওনি। আমাকে পাবার জন্যে তোমাকে বহুবার পৃথিবীতে আসতে হয়েছিল।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই কথা ধ্রুব স্বীকার করতে অথবা গ্রহণ করতে পারেন নি। ধ্রুবর মনে যথিষ্ট পরিমাণে সন্দেহ, অবিশ্বাস ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেটা বুঝতে পেরে, ধ্রুবকে বললেন, "তুমি আমার সাথে একটি স্থানে চল।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধ্রুবকে বিশাল একটি প্রান্তরে নিয়ে গিয়ে বললেন, "ধ্রুব! বহুদরে যেটা দেখতে পাচ্ছ, সেটা কি?"

ধ্রুব বললেন, "এটা পাহাড়"। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধ্রুবকে বললেন, "এটা পাহাড় নয়, তুমি যতবার এই পৃথিবীতে এসেছ, ততবারের তোমার দেহাস্তি একস্থানে পুঞ্জিভূত হয়ে পাহাড়ের সৃষ্টি হয়েছে।"

জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

ঘটনাটি ঘটেছিল সত্যযুগে। সতীর দেহত্যাগের পরে, সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি মেনকাকে বলেছিলেন, "তোমার ঘরে সতীর আবির্ভাব হবে।" মেনকা তখন তার স্বামী হিমালয়রাজকে সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতির কথাটি জানান, তখন হিমালয়রাজ আনন্দে উল্লসিত হয়ে বলেছিলেন, "সতীর আমার ঘরে আসবে, এটা আমার অত্যন্ত সৌভাগ্য। আমার কত জন্মের পূণ্যের ফল।" পরবর্তী কালে সতী যখন হিমালয় রাজের ঘরে আসলেন, তখন তার নাম হল পার্বতী, স্বাভাবিকভাবেই পার্বতী দেবাদিদেব মহেশ্বরকে স্বামীরূপে পাওয়ার জন্য সুকঠিন তপস্যায় বসেন। অনেকে বলে থাকেন, পার্বতী হরিদ্বারে তপস্যা

করেছিলেন। পাবর্তীর সুকঠিন তপস্যায় দেবাদিদেব মহেশ্বর অত্যন্ত প্রীত ও সন্তুষ্ট হন। তিনি পার্বতীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলেন।

জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে বহু ঘটনা এবং উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

এবার আমরা যাব অন্য একটি প্রসঙ্গে। প্রসঙ্গটি হচ্ছে আত্মা সম্পর্কে। মৃত্যুতে দেহের বিনাশ ঘটে। কিন্তু আত্মার বিনাশ ঘটে না। আত্মা অবিনশ্বর।

"জীর্ণ দেহং বিহায়। নূতনং গৃহ্নাতি। মৃত্যুর পরে আত্মা নতুন দেহ ধারণ করে এই পৃথিবীতে আসে।

এবার আমাদের আসতে হবে, মৃত্যুর পরে আত্মা কোথায় বিরাজ করে।

এটা প্রকৃতির নিমগ্ন স্বাভাবিক চিরন্তন জাগতিক বাস্তব, সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি মানুষ কোন পরিস্থিতিতেই এক এবং অভিন্ন হতে পারে না। প্রতিটি মানুষের সাথে প্রতিটি মানুষের পার্থক্য থাকবেই।

আমাদের পার্থিব জগতের বহু উর্দ্ধে, স্বপ্নাতীত, কল্পনাতীত উর্দ্ধে একাধিক এবং অসংখ্য স্তর রয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোন আত্মা কোন্ স্তরে বিরাজ করবে। আত্মা কোন স্তরে বিরাজ করবে। এটা পরিপূর্ণরূপে নির্ভর করছে, জীবিত অবস্থায় পার্থিব জগতের কর্মফলের উপরে। পার্থিব জগতের কর্মফল যার যত উন্নত মঙ্গলময় এবং ঈশ্বর পরায়ন হবে, তার আত্মা তত উর্দ্ধে স্থান পাবে।

অপরদিকে, যে সব ব্যক্তি পার্থিব জগতে থাকাকালীন, অতিরিক্ত পরিমাণে বিষয়ী বিষয়াসক্ত, পার্থিব জগতের প্রতি মোহ আকর্ষণ আসক্তি মায়া যত বেশী হবে, সেই আত্মা বিরাজ করবে নিম্ন স্তরে।

জীবিত অবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি, ভীষণভাবে অপরাধ প্রবণ, এককথায় যদি পাশবিক মনোবৃত্তি প্রবল আকার ধারণ করে, তার আত্মা বিরাজ করবে আরও অধিক পরিমাণে নিম্নস্তরে এই সব ধরণের আত্মাকে নতুন দেহ ধারণ করে, পুনরায় পৃথিবীতে আসতেই হবে।

অপরদিকে, যদি কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয় অপঘাতে, যেমন গলায় দড়ি দিয়ে মৃত্যু, বিষপান প্রভৃতি অবাঞ্ছিত পথ দিয়ে, তাদের আত্মা কোনদিনও মুক্তি পাবে না।

প্রসঙ্গত এবার আসছি অন্য একটি প্রসঙ্গে। প্রসঙ্গটি হচ্ছে, প্ল্যানচেট্। প্ল্যানচেট্ করলে এই সব ধরণের কুকর্মের আত্মা অতি সহজে অতি শীঘ্র এসে যায়?

মৃত্যুর পরে আত্মার বিভিন্ন স্তরে অবস্থান নির্ভর করছে, পার্থিব জগতে থাকাকালীন তার সমগ্র জীবনের কর্মফলের উপরে। যে আত্মার পার্থিব জগতে অবস্থান কালীন তার সমগ্র জীবনের কর্মফল যত শুভ কল্যাণময় ঈশ্বর পরায়ন হবে, তার আত্মা সর্বদা উচ্চস্তরে বিরাজ করবে।

এবার আমরা যাব অন্য একটি প্রসঙ্গে। অনেকের মুখ থেকেই একটি কথা শোনা যায়। কোন একজন ব্যক্তি পরম দার্শনিক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রশ্ন করেছিলেন। প্রশ্নটি হচ্ছে এইরকম, কোন মানুষ জীবিত অবস্থায় তার কর্মফল কি সম্পূর্ণরূপে ভোগ করে? এই প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, "কিছুটা কর্মফল বর্তমান জন্মে ভোগ করবে। অবশিষ্ট কর্মফল ভোগ করার জন্য, তাকে পুনরায় পৃথিবীতে আসতে হবে।"

যে আত্মা পার্থিব জগতে থাকাকালীন, আধ্যাত্মিক জগতে যতটা উন্নতিলাভ করবে, সে আত্মা বিরাজ করবে, আরো উর্দ্ধ স্তরে।

এবার আমরা যাব অন্য একটি প্রসঙ্গে। পার্থিব জগতে থাকাকালীন, কোন ব্যক্তি যদি নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি অমানবিক ব্যবহার করে, এমন কি নিরপরাধ ব্যক্তিকে যজি হত্যাও করে থাকে, তবে তার কুকর্মের ফল ভোগ এবং প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য পুনরায় সেই ব্যক্তিকে পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে।

এর পটভূমিকায় আমরা ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের ঘটনায় আসতে পারি।

ঘটনাটি ঘটে ছিল ত্রেতা যুগে। শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত অন্যায়ভাবে নিরপরাধ বালিকে বধ করেছিলেন।

এবার আসছি দ্বাপর যুগের ঘটনায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে এবং তারও অনেক পরে, পঞ্চপাণ্ডব এবং দ্রৌপদী মহাপ্রস্থানের পথে চলে যাওয়ার পরে শ্রীকৃষ্ণ একদিন এক সুগভীর বনে একটি বৃক্ষের নীচে তাঁর একটি পায়ের উপর আর একটি পা রেখে অত্যন্ত মনের দুঃখে এবং দুশ্চিন্তায় বসেছিলেন। কারণ তিনি দেখতে পাচ্ছেন, তাঁর চোখের সামনে তাঁর যদুবংশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অমত তাঁর করার কিছু নেই। তিনি সম্পূর্ণরূপে নিরুপায় এবং অসহায়।

এইরূপ পরিস্থিতিতে, হঠাৎ একটি বান এসে তাঁর পায়ে বিদ্ধ হল। তার পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এমন সময়ে হঠাৎ একজন ব্যাধ এসে উপস্থিত। ব্যাধ বলল, "আমি মৃগ মনে করে, বান নিক্ষেপ করেছিলাম। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"

যে ব্যাধটি মৃগ মনে করে, ভুলবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের চরণে বাণ নিক্ষেপ করেছিল, আসলে সেই ব্যাধ ছিল ত্রেতা যুগের বালি। বালি তার অন্যায়ভাবে মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য, দ্বাপর যুগে ব্যাধ হয়ে এই পৃথিবীতে সেছিল।

যে ব্যক্তি পার্থিব জগতে থাকাকালীন, যদি নিজস্ব জ্ঞান, ভক্তি, শ্রদ্ধা পরিপূর্ণ বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীলতা পরিপূর্ণ আত্ম সমর্পণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে যদি ঈশ্বরের দর্শন লাভ করে থাকেন, তবে সেই ব্যক্তি আর পৃথিবীতে ফিরে আসবে না। তাঁর আত্মা পরমাত্মার সাথে মিলিত হবে।

পার্থিব জগতে থাকাকালীন, কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর আরাধ্য দেব-দেবীর

শ্রীচরণে পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেন, আরাধ্য দেব-দেবী যদি তাঁকে তার শ্রীচরণে স্থান দেন, তবে শুধুমাত্র তাই নয়, পার্থিব জগতের প্রতি যদি বিন্দুমাত্র আকর্ষন, মোহ, মায়া, আসক্তি না থাকে, তবে মৃত্যুর পরে, সেই ব্যক্তিকে আর পৃথিবীতে আসতে হবে না।

প্রসঙ্গত এবার আমি যাব পুনরায় প্ল্যান্টচেটের প্রসঙ্গে। একটি কথা একাধিক ব্যক্তির মুখে শোনা গিয়েছে। বিশ্বকবি এবং পরম দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্ল্যানচেট করা হয়েছিল কিন্তু তিনি কোন বারও প্ল্যানচেটে ধরা দেন নি। তার কারণ জীবিত অবস্থায় তিনি স্বীয় প্রচেষ্টায় আধ্যাত্মিক জগতে সুগভীরভাবে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি একাধিক রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

এবার আমি যাব সম্পূর্ণরূপে অন্য একটি প্রসঙ্গে।

একটি কথা অথবা বিষয় অবশ্যই স্মরণ রাখা উচিত। প্রতিটি মানুষের জীবনে কোন সময়েই অস্বাভাবিক, অতিপ্রকৃত, অলৌকিক ঘটনা, আধ্যাত্মিক ঘটনা ঘটে না।

তবে কোন কোন মানুষের জীবনে হৈ সব ঘটনা ঘটে থাকে। তবে আশ্চর্য্যের বিষয়, যার জীবনে ঘটে, শুধুমাত্র সেই বিশ্বাস করে। যাদের জীবনে ঘটে না, তারা কখন বিশ্বাস করে না। অথচ এই সব অস্বাভাবিক ঘটনা, যদি কোন অবিশ্বাসী সন্দেহ পরায়ণ ব্যক্তির জীবনে ঘটে, তখন সেই ব্যক্তি বিশ্বাস করবে।

আত্মা কোন কোন সময়ে দেহ ধারণ করে তার একান্ত প্রিয়জনের কাজে আসে এবং আসতে পারে। এরই পটভূমিকায়, বিখ্যাত লেখক ত্রৈলক্য মুখোপাধ্যায়ের লেখা "কাশী কবিরাজের গল্প" সর্ম্পকে বলা যায়। গল্প হলেও, একটি সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিতা কাহিনীটি খুব বিরাট। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ ঘটনাটি অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করছি।

আমাদের দেশে যখন জমিদারি শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, সেই সময় কার একটি ঘটনা।

জমিদারি আমলে জমিদারদের বাড়ীর বাহিরে বৈঠকখানা থাকত। কোন নবাগত ব্যক্তি এলে, সেই বৈঠকখানায় থাকতে পারত।

এবার আমি যাচ্ছি মূল ঘটনাটিতে জমিদারের স্ত্রী বহুপূর্বে মারা যান। কিন্তু একটি অতি অল্প বয়স্ক সন্তান ছিল। জমিদার পরবর্তীকালে পুনরায় বিয়ে করেন।

কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, জমিদারের স্ত্রী পূর্বের সন্তানের সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করতেন। প্রায় ছেলেটিকে খুব মারধর করতেন। শেষ পর্যন্ত ছেলেটি খুব অসুস্থ হয়ে পরে। প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি

হয়। জমিদার তখন তাঁর ছেলেকে সুস্থ করার জন্য একজন কবিরাজকে নিয়ে আসেন। কবিরাজ থাকতেন জমিদার বাড়ীর বাহিরে বৈঠকখানায়।

কবিরাজ প্রতিদিন গভীর রাত্রিতে দেখতেন, সুদূর থেকে একজন মহিলা অতি দ্রুতগতিতে এসে, জমিদার বাড়ীতে ঢুকতেন। এইরকম ভাবে প্রতিদিন গভীর রাত্রিতে এই রকম ঘটনা দেখে, মূল ঘটনাটিকে জানার জন্য, কবিরাজ একদিন হঠাৎ জমিদার বাড়ীতে প্রবেশ করার পথে, মহিলাটির সামনে এসে উপস্থিত হলেন।

কবিরাজ মহিলাটিকে বললেন, "আপনি কে? প্রতিদিন গভীররাত্রিতে আপনি জমিদার বাড়ীতে আসেন কেন?"

এই প্রশ্নের উত্তরে মহিলাটি বললেন, "আমি আসি আমার ছেলেকে নিয়ে খাবার জন্য। কারণ আমার ছেলেকে তার বিমাতা খুব মারধর করে। খুব কষ্ট এবং যন্ত্রণা দেয়। আমি আমার ছেলের কষ্ট যন্ত্রণা অত্যাচার সহ্য করতে পারছি না। সেজন্য আমার ছেলেকে এখান থেকে নিয়ে যাব।"

কবিরাজ তখন বললেন, "মা তুমি এখান থেকে চলে যাও। আমি আমার চেষ্টার মধ্য দিয়ে, তোমার ছেলেকে সুস্থ করে তুলব। আমি তোমার ছেলেকে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেব। তুমি কোন চিন্তা কর না। তুমি এখান থেকে চলে যাও।"

পরের দিন সকালে কবিরাজ জমিদারবাবুকে সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বললেন। এদিকে ছেলেটি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে গেল। জমিদারবাবু তাঁর ছেলেটিকে তার মামার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন।

এই ঘটনাকে অবলম্বন করেই, আমি নিজে একটি বিশেষ দিকের আলোকপাত করছি।

যে কোন লেখক যখন কোন কিছু লেখেন। তখন স্বাভাবিকভাবে আবশ্যিকরূপে, নিজের জীবনের কিছু কথা অথবা কোন ঘটনা এসে যায়। এই পরিস্থিতিকে কোন অবস্থাতেই বাদ দেওয়া যায় না।

এবার আমি জীবনের একটি বাস্তব সত্য ঘটনা তুলে ধরছি।

১৯৩৫ সালের একটি ঘটনা। আমি সবে মাত্র শিক্ষকতায় প্রবেশ করেছি। আমাদের স্কুলটি হাই রোডের ধারে অবস্থিত। প্রসঙ্গত একটি কথা বলা প্রয়োজন। আমি যে সময়ে শিক্ষকতায় প্রবেশ করেছিলাম, সেই সময়ে শিক্ষকদের জন্য ??? ব্যবস্থা ছিল। তখন আমি থাকতাম আমাদের স্কুলের পিছন দিকে অনেক দূরে একটি গ্রামে।

প্রসঙ্গত একটি কথা। আমি যখন কলেজে পড়তাম, তখন আমার পিতার মৃত্যু হয়।

আমি যে সময়কার কথা বলছি, তখন আমাদের স্কুল সকাল বেলায় হত। আমি প্রতিদিন

বিকালে বাজারে আসতাম। সন্ধ্যার কিছু আগেই, বাজার থেকে রওনা দিতাম। আমি থাকতাম গৃহস্থের বাড়ীর বাহিরে বৈঠকখানায়। মাত্র পাঁচ মিনিচের ব্যবধানে আমি আমার মৃত পিতাকে সশরীরে দেখতে পাইনি।

আমি কেবলমাত্র আমার বাসস্থানে এসেছি। এখন সময়ে সেই বাড়ীর চার পাঁচ ব্যক্তি আমাকে বললেন, "আপনার বাবা এসেছিলেন।" আমার বৈঠকখানায় বারান্দায় একটি চেয়ার ছিল। সকলে বললেন, "আপনার বাবা এই চেয়ারে বসেছিলেন। আপনার বাবা বলেছিলেন, "আমি পুলকের বাবা।" আমার বাবার সাথে সেই ব্যক্তিদের কি কথা হয়েছিল, সব কিছুই খুলে বলেছিলেন। আমি আমার বৈঠকখানায় আমার পাঁচ মিনিট পূর্বেই, আমার বাবা সেখান থেকে চলে যান।

আমি আমার জীবনের বাস্তব সত্য ঘটনা প্রকাশ করলাম। আমি জানি, আমার জীবনের এই ঘটনা হয়ত অনেকে বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করুন, অথবা কেউ বিশ্বাস না করুন, আমার জীবনে যেটা ঘটেছে, সেটাকে আমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারব না।

এবার আমি যাব রামায়ণের পটভূমিকায়। রামায়ণের পটভূমিকায় যে ঘটনার উল্লেখ করছি সেই ঘটনার সাথে সকলেই পরিচিত। শুধুমাত্র তাই নয়। রামায়ণের ঘটনার সাক্ষী অথবা প্রমাণ, বর্তমান আধুনিক যুগের একবিংশ শতাব্দীতেও। রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং সীতা যখন বনবাস জীবন যাপন করছিলেন, সেই সময়ে তাঁরা বনের মধ্যে কুটীর নির্মাণ করে বাস করেছিলেন।

একদিনের একটি ঘটনা। রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ কোন কারণে অথবা কোন প্রয়োজনে কুটীরের বাহিরে ছিলেন। কুটীরের মধ্যে ছিনেল শুধু মাত্র সীতাদেবী।

অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতরূপে রাজা দশরথ সশরীরে সীতাদেবীর সামনে উপস্থিত হলেন। রাজা দশরথ সীতাদেবীকে বললেন, "সীতা! তুমি আমাকে পিন্ডদান কর।" সীতাদেবী তখন সম্পূর্ণরূপে নিরুপায় এবং অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। আর কোন উপায় অথবা কোন পথ না দেখে, সীতা দেবী বালি দিয়ে রাজা দশরথকে পিণ্ডদান করলেন। রাজা দশরথ সন্তুষ্ট এবং অত্যন্ত প্রীত হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

এই ঘটনার কিছু পরেই, রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ কুটীরে এসে উপস্থিত হলেন। সীতাদেবী তখন সম্পূর্ণ ঘটনাটি শ্রীরামচন্দ্রকে জানালেন। শ্রীরামচন্দ্র ঘটনাটিকে বিশ্বাস করতে চাইলেন না। তিনি ঘটনাটিকে অস্বীকার করলেন। শ্রী রামচন্দ্র সীতাদেবীকে প্রশ্ন করলেন, "আমার পিতা যে সমীরকে এসেছিলেন, তার কোন প্রমাণ দিতে পারবে?"

সীতাদেবী তখন বললেন, "আমি প্রমাণ দিতে পারব। প্রমাণ দেবার জন্য তিনজন রয়েছে। সেই তিনজন হচ্ছে তুলসীগাছ, ফল্যনদী এবং বটবৃক্ষ।"

শ্রীরামাচন্দ্র তখন তুলসী গাছকে প্রশ্ন করলেন, "তুলসী! তুমি কি আমার পিতাকে সশরীরে দেখেছ?" তুলসী গাছ বলল, "প্রভু! আমি আপনার পিতাকে সশরীরে দেখিনি।"

এরপরে শ্রীরামচন্দ্র প্রশ্ন করলেন, ফল্গুনদীকে। শ্রীরামচন্দ্র ফল্গুনদীকে বললেন, "ফল্গু! তুমি কি আমার পিতাকে সশরীরে দেখেছ" ফল্গু নদী উত্তর দিল, "প্রভু! আমি আপনার পিতাকে সশরীরে দেখিনি।"

সর্বশেষে, শ্রীরামচন্দ্র বটবৃক্ষকে প্রশ্ন করলেন, "বটবৃক্ষ! তুমি কি আমার পিতাকে সশরীরে দেখেছ?"

বটবৃক্ষ তখন উত্তর দিল, "প্রভু! আপনার পিতা সশরীরে এসেছিলেন। আমি আপনার পিতাকে সশরীরে দেখেছি। আপনার পিতা সীতাদেবীর কাছে পিণ্ড চেয়েছিলেন। সীতা দেবী বালি দিয়ে আপনার পিতাকে পিণ্ডদান করেছেন। আমি সীতাদেবীকে বালি দিয়ে আপনার পিতাকে পিণ্ডদান করতে দেখেছি।"

এই ঘটনার পরে সীতাদেবী অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে, তুলসী গাছকে অভিশাপ দিয়ে বললেন, "তুলসী! তুমি মিথ্যা কথা বলেছ। আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, তোমার গায়ে কুকুরে প্রস্রাব করবে।"

তুলসী গাছ তখন ছুটে এসে সীতাদেবীর পা জড়িয়ে ক্ষমা চাইল এবং বলল, " আমার গায়ে কুকুরে প্রস্রাব করলে, আমি পূজার অযোগ্য হয়ে পরব।"

তখন সীতা দেবী তুলসী গাছকে বললেন, "তোমাকে জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে নিলেই, তুমি পূজার যোগ্য হবে।"

এরপরে সীতা দেবী ফল্গুনদীকে তার মিথ্যা কথা বলার জন্য, ফল্গুনদীকে অভিশাপ দিয়ে বললেন, "তুমি মিথ্যা কথা বলেছ, তুমি অন্তসলীলা হবে।"

সেই ফল্গুনদী এখনও রয়েছে। তবে ফল্গু নদী বালির নীচে ঢাকা অবস্থায় রয়েছে উপর থেকে বেশ কিছুটা বালি তুলে নেবার পরে, ফল্গু নদীর জল দেখা যায় এবং পাওয়া যায়।

সর্বশেষে, সীতা দেবী বটবৃক্ষকে তার সত্য কথা বলার জন্য, বটবৃক্ষকে আশীর্বাদ করে বললেন, "বটবৃক্ষ! তুমি দীর্ঘজীবি হবে।"

এটা বাস্তব সত্য, যত রকমের গাছ রয়েছে, তাদের মধ্যে একমাত্র বটগাছ দীর্ঘজীবি।

এবার আমি যাব, আমার আলোচনার পরিসমাপ্তির অভিমুখে।

বর্তমানে আমি জীবনের শেষ অধ্যায়ে উপনীত। আমার জীবন সূর্য ধীরে ধীরে অসীম নভমণ্ডলের পশ্চিম দিগন্তের দিকে এগিয়ে চলেছে। অপরদিকে, বিপরীত দিক থেকে গোধূলী লগ্ন আমার জীবনের দিকে এগিয়ে আসছে। যখন গোধূলী লগ্ন আমার জীবনকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করবে, তখন অবশ্যম্ভাবী অনিবার্যরূপে সর্বোপরি প্রকৃতির নিয়মে, আমার জীবনে নেমে াসবে চরমতম পরিসমাপ্তি। ধূলি ধূসরিত পার্থিব জগতের শোক-তাপ-দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা-বেদনা-শোকাহত-মর্মাহত-অশ্রুসিক্ত জীবনের চরমতম পরিসমাপ্তি।

আমি জানি না, মৃত্যুর পরে আমার আত্মা কোন্ স্তরে বিরাজ করবে। এই চরম চিরন্তন জাগতিক বাস্তব সত্যকে একমাত্র উপলব্ধি করবেন আমার তথা প্রতিটি মানুষের অন্তর্যামি।

অহং স্মরামি মম পরমাধ্যাদেবী-আদ্যাশক্তি মহামায়াম্। দেবী প্রসীদ। স্মরণাৎ পরং স্থানং দেহি তব শ্রীচরণে। মা পুনঃ প্রেরয়তু বিষাদ সিন্ধু সদৃশং তমসাচ্ছন্ন ভূখন্ড মে। স্মরামি তব মহিমা অহর্নিম্মম। প্রণমাণি তব শ্রীচরণম্। দেবী প্রসীদ। দেবী প্রসীদ।